Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিষ্ণু দে-র কবিতায় শব্দব্যবহার

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈকত আসগর
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.9
Pages	161-180
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিষ্ণু দে-র কবিতায় শব্দব্যবহার

সৈকত আসগর

বিষ্ণু দে-র ভাষা আলোচনায় প্রথমেই আসে তাঁর শব্দব্যবহারের সফলতার কথা। ভাষার শরীর নির্মাণের প্রধান উপাদান শব্দ। সে শব্দকে বিষ্ণু দে নাড়াচাড়া করেছেন ম্যাজিশিয়ানের মতো। ম্যাজিশিয়ানের হাতের বল যেমন সুনিয়ন্ত্রিত চালে একটি বৃত্ত নির্মাণ করে, বিষ্ণুদে-ও সুনিয়ন্ত্রিত চালে ঠিক তেমনিভাবে শব্দ নিয়ে খেলেছেন। সেজন্য তাকে আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দ-ম্যাজিশিয়ান হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি ম্যাজিশিয়ানের মতো খেলা দেখিয়েছেন তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি বা লোকজ, বিদেশি, অপ্রচলিত, সঙ্গীতবিষয়ক, অন্ত্যজ শ্রেণীবিষয়ক, রাজনীতিঘেষা শব্দ নিয়ে। তবে বিষ্ণুদে-র ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর লেখা 'মালার্মেঃ প্রগতি' কবিতাটি মনে রাখতে হবে। কবিতাটির কিছু অংশঃ

> মালার্মে! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
> পরবশ ধূর্ত স্মার্ট বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
> জীর্ণশীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
> অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর;
> তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
> আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
> কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
> শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর-কষায়.....
>
> (*বছর পঁচিশ*, পৃ.২৪৩)

বিষ্ণু দে শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ দেশজ ভাষায় বা আঞ্চলিক মুখে মুখে কিংবা স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে অন্বেষণ করেছেন। তবুও তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। এ-ধরনের কিছু উদাহরণ দেয়া যাক :

উর্বশী, পুরুরবা (উর্বশী ও আর্টেমিস), বজ্রপাণি, দধীচি, দেবযানী, উলূপী, গন্ধর্ব, কিন্নর, দুর্বাসা, গৌরী, অপস্মার, ত্রিশঙ্কু, দুঃশাসন, বৃহন্নলা, শিখণ্ডী, অতনু, কল্কি, মেনকা, মারীচ (চোরাবালি), ভূশণ্ডী, শিব, দুর্গা, ভূমা, কৈলাস, কপিল, বিম্ববতী, শিবালী, দময়ন্তী, ইন্দ্রপ্রস্থ, মহেশ্বর, অনুপূর্ণা, খাণ্ডব, মুনিষ, কাদম্বরী, চন্দ্রাপীড়, মহাশ্বেতা, যযাতি, বিশালাক্ষী, পার্বতী, বীণাপাণি, অহল্যা, জতুগৃহ, সাবিত্রী, তনুপর্ণ, কুম্ভীপাক, মীনকেতু, দশভূজা (স্মৃতিসত্তাভবিষ্যৎ) নচিকেতা, কৌটিল্য, কুবের, ভীষ্ম, ভগীরথ, জহ্নু, হবিষ্মতী, নহুষ, কান্তা, পার্থ, ইলোরা, অশস্ত্যবিক্ষ, ধূর্জটি, গিরিশ, অগস্ত্য, মথুরা, মিথিলা, জিষ্ণু, হরধনু, পরশুরাম (আলেখ্য), কালিন্দী, বাসুকী, রিষ্টি (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ), গরুড়, যুযুৎসু, দ্রোণ, আরণ্যক, কুরুক্ষেত্র, বিভীষণ, কূরু মণ্ডুক, কুমারসম্ভব, অসূয়া, বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী, জামদগ্ন্যযক্ষ, অর্জুন, কালী, কৃতকৃতম, কৃষ্ণ, কাশ্যপ, রুক্মিণী, সরস্বতী (অন্বিষ্ট) ত্রিবাঙ্কুর, দ্বৈপায়ন, মৈনাক, রৌরব, অক্ষৌহিনী, ধৃতরাষ্ট্র, মনসা, মন্দাকিনী, বহলীক, ইন্দ্রানী, কংস, (সন্দ্বীপের চর), ইরা, প্রপঞ্চ, শ্রীমন্ত, ত্রস্তস্থায়ু (সাতভাই চম্পা), ভগ্নদূত, অগ্নি কুক্কুট, চণ্ডী, মেঘনাদ, হলধর, অষ্টচক্র, হিরণ্যকশিপু, মাথুর, সুষুম্না, মাতরিশ্বা, বাসুদেব, গণেশ, সংহিতা, হৈমবতী, নৃসিংহ, প্রহলাদ, জটায়ু, ছিন্নকস্থা, সুভদ্রা, যাদব, ভার্গব, গাণ্ডীব, মধুকৈটভ, কল্মস্র, দ্বারকা, পুন্নাম, অবধূত, দংষ্ট্রাকরাল, (পূর্বলেখ), মেনকা, কীচক, অপচেতা, কর্কট, স্বৈরিন্দ্রী, পুরাণ, জানকী, রামায়ণ, অর্গ, রাম, সূর্যবংশ, পাণ্ডব, মাৎস্যন্যায়, পাতক, কুন্তী, পাঞ্চালী, তূর্ণ, গান্ধারী, কূর্ম (ঈশাবাস্য দিবানিশা), ক্লৈব, পাণ্ডু, কীর্তন পরমেশ্বর (উত্তরে থাকো মৌন), রাধা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কানু, উমা, মনু, (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার), সীতা, হরগৌরী, হনুমান, দশানন, ছিন্নমস্তা, বিষ্ণু, কিরাত (চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর), অরুন্ধতী, পাণ্ডব, বৈদেহী, স্বাহা, অনসূয়া, অনঙ্গদেব, মথুরা, বৃন্দাবন (সংবাদ মূলত কাব্য) মান্ধাতা, কম্বুগ্রীবা, সাষ্টাঙ্গ (আমার হৃদয়ে বাঁচো) প্রভৃতি।

সংস্কৃত বা তৎসম বা আর্য শব্দের উদাহরণ আরও অনেক বাড়ানো যেত। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এখানকার শব্দগুলো মূলত পুরাণ সম্পর্কিত এবং ভারতীয় ঐতিহ্যদ্যোতক। যারা বিষ্ণুদে-তে শুধু বৈদেশিক প্রীতি লক্ষ্য করে থাকেন উপরের তৎসম বা সংস্কৃত আর্য শব্দমালা তাঁদের ভুল ভাঙাতে অনেকটা সহযোগিতা করবে। আমরা বিষ্ণু দে-র কবিতায় শুধু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগই দেখিনা কখনো কখনো সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ এবং বাক্যেরও সন্ধান পাই। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। সংস্কৃত না-জানা বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তা অন্তপীড়ার কারণ। যেমন-

আজকে অন্যত্র দাস বংশীদের নৃশংসতা দেখে
নটরাজ শিঙাধরে সে কবিসংবিতে নীলকণ্ঠ অন্ধকারে সদ্য সবিতায়।
সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ
সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বভাতিং
সবিতানো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ।

(*বছর পঁচিশ*, ৮৪)

বাংলা শব্দমালার পাশাপাশি সংস্কৃত শব্দমালার সংস্থাপন ঘটিয়ে বিষ্ণু দে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সাঙ্গীতিক ধ্বনিকে এক সঙ্গে বেঁধেছেন। কিন্তু তাঁর এক্সপেরিমেন্টকে সমালোচনার খাতিরে যথেষ্ট মূল্য দেয়া গেলেও সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে এর খুব গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। সে যাহোক, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দপ্রীতি বিষ্ণুদে-কে সংস্কৃত পণ্ডিত করে তোলে নি। তাঁকে কবিই করেছে। আর সে জন্য কবি কালিদাস, স্যার উইলিয়ম জোন্স, জর্জ ফর্স্টার, হার্ডর, গ্যায়টে প্রমুখ ইউরোপীয়দের দৃষ্টি-ধন্য কালিদাস, বিষ্ণু দে-র কবিতায় বারবার ফিরে আসে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও কালিদাস এসেছেন, কিন্তু বিষ্ণুদে-র কালিদাস-চিন্তা তাঁর থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছেন কিন্তু বিষ্ণু দে কালিদাসের কালের জানালা দিয়ে বর্তমানকে দেখেছেন।

বিষ্ণু দের কবিতায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে তা অধিক পরিমাণে নয়। কটি উদাহরণ—কল্যাণীয় কল্পনায় নিত্যকাল রহেছি মগন, মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত, সকল জনম ভরে কাঁদো কি? বর্ণাঢ্য বিদায়ে তাঁর ক্রান্তির বারতা/আকাশে আকাশে মুক্ত নির্বাচনে দুহাতে বিতরে। প্রভৃতি। আর তদ্ভব শব্দগুলো নিয়ে তো আধুনিক সাহিত্যের প্রধান কারবার, তাই উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় এক অপূর্ব মমতায় দেশি বা দেশজ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্য লিখিত সেই ভাষা কবিতায় বলতে চেয়েছেন, যে ভাষা আকাশে আবেগ ঘনায় এবং যে ভাষায় পরস্পরে আত্মদান করে, সে ভাষা তিনি ভালবাসেন। বিষ্ণুদে 'ভাষা' কবিতায় আরও লিখেছেন—

নববাবু ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে ঝনন-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বজনে,
সাবেক নতুন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।
(বছর পঁচিশ, পৃ.৩২)

অর্থাৎ বিষ্ণুদে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকেই তাঁর কবিতার ভাষা করতে চেয়েছেন। ম্যাকস্‌মুলার বলেছেন:The real and natural life of language is in its dealects. ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তার উপভাষাগুলোতে। বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় উপভাষা বা দেশজ বা লোকজ শব্দকে

গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। কিছু উদাহরণ — সরকারী বনে কার সাড় ভাঙে, কারা ভাঙে *আড়ামোড়া!* আজ উন্নতির *ফোঁপরা* বুলি শিখে, করতলগত শক্তি রক্ষার উৎসবে মোখুরা, *ঢেম্‌না*, গোধা, দুয়ারে *হুড়কো* কাঁদে, জানলার ছিটকিনি পালায়, তাই তো আলিসা ধরে মেলে দেয় বেনী, পাতাঝরা নতুন পাতার *আঁকশিতে* অঙ্কুরে আপাতত এই *প্যাটরাটার* উপরে শুয়ে পড়ি — বাজারে বুদ্ধির *বখরার*/অভ্যাস চলেনা প্রেমে, সারাদিন গৃহহীন ঘোরে খেদানো কয়েকপাল/জারজ কুকুর, তোমাকে কে শিবা বলে তোমরাই তো মাথার *ইলেক* প্রভৃতি। সাধারণ মানুষের জীবনের কথা বিষ্ণুদের কবিতায় রূপ পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের ভাষাও তাঁর কবিতায় যথেষ্ট মর্যাদা ও মূল্য পেয়েছে। বিষ্ণুদে'র কবিতায় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ চাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলেরা যেমন ভিড় করেছে, তেমনি তাদের মুখের ভাষাও স্থান করে নিয়েছে অবলীলায়। যদিও সেই সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভাষায় অনেক শব্দের মূল খুঁজতে গেলে সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি শব্দের কাছে যেতে হয়, যেমন—'ঘুঁটে' ও 'তবিল' শব্দ দুটি। 'ঘুঁটে' শব্দটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার গোবিষ্ঠা থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা '*গোইট্‌ঠা*'র মধ্য নিয়ে, 'আরবী তহবীল থেকে এসেছে তবিল শব্দ দুটি, কিন্তু 'ঘুঁটে' বা 'তবিল' এদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, তাদের আর অন্যরূপে চেনা যায় না। বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ চাষী, কামার, কুঁমোর, ছুতোর জেলে প্রভৃতি যে জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাদের মুখের ভাষার সুন্দর একটি চয়নিকা নির্মাণ করা যায়ঃ

গেরো, বেয়াই, চোঙা, ঢাউস, কাস্তে, হাতুড়ি, চাতাল, গুহ্‌, গোবর, আড়ং, চাচা, খামার, খিস্তি, লঙ্কার ঝাল, পাইকারী, বাটপার, বাজার নিমক হালাল, তুখোর, দালাল, পাটের ছালা, চিড়, কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতী, কামার, কুঠার, ডিঙি, লাঙল, হাপর, কারখানা, খিচুড়ি, লঙ্গরখানা, মাকু, জাল, দড়ি, লাঙলের ফলা, মজানদী, মরাখাল, খাড়ি, ফেউ, ছুতোর, কামার শাল, মাসতুতো ভাই, ডকের খালাসী, নুন, ক্ষেত, পড়শি, কাঠ কুড়ানীর ছেলে, খেউড়, চুড়ি, ঢোলক, কুড়া, দাদা, ঠাকুরমা, চটকল, কয়লাখনি, মাটিরলোক, খুদকুড়া, ঘড়া, চামড়া, পথের মানুষ, ভিখারীর চোখ, মাৎলা, পাল, হাল, আঁস্তাকুড়, চণ্ডাল, তরপুন, বাটালি, পিঁড়ি, সতীন, সিধা, তাগা, তাবিজ, ভিখ, ভিড়মি, ভায়রাভাই, পিসে মেসো, চাষা, মরদ, আইঢাই, খেদা, জিরা (জিরানো), গামছা, স্বাচিপান, শালতি, ছিপ, খড়কুটা, গিট, ঘিনজি, ব্যাদা, তাঁত, কাঙাল, মা, বাবা, দিদি, মাসী, দাওয়াই, বৈদ্য, কুড়ে, লরি, খিচুড়ি, পোলো, চুলো, ঢেলা, কেচ্ছা, খিটিমিটি, ফুটা, কুড়াল, করাত, পুটকে, পুত, ফচকে, ক্ষুর, নরুন, খাটিয়া, কম্বল, বাবুর্চি, বেঢপ, চাটাই, মুড়ি-মুড়কি, চৌকি, টুল, পিসি, আতুড়, ইয়ার্কি, খেদানো, আগাইয়া, গলা খাঁকরা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে তিরিশের কবিরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সে কৃতিত্বের পূর্বসূরী গদ্যে যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র, কবিতায় তেমন আমাদের 'আদি আধুনিক' মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিষ্ণুদের কবিতায় ব্যবহৃত 'হুড়কো' এবং 'খেদানো' শব্দ দুটো মাইকেলেও দেখা দিয়েছিল। আমরা মধুসূদনের *মেঘনাদ বধ* ও *বীরাঙ্গনা কাব্য* থেকে কিছু আঞ্চলিক বা দেশজ শব্দ উদ্ধার করিঃ ১. অমনি দুয়ারী/টানিল হুড়কাধরি হুড় হুড়! (*মেঘনাদবধ কাব্য*, তৃতীয় সর্গ, পৃ. ৮৩) ২. তারা দলে আইলা রজনী (ঐ অষ্টম সর্গ, পৃ. ১৩২) ৩. কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে/তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে! (ঐ, নবম সর্গ, পৃ. ১৫১) ৪. মন্দাকিনী—পূত জলে ধুইয়া যতনে/শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল/ দাহস্থানে রক্ষোদল (ঐ নবম সর্গ, পৃ. ১৫০) ৫. আইবড় আছে কি হে গৃহে/দুহিতা? (বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্থ সর্গ, পৃ.১৮২) ৬. মাথা তার কাট তুমি আসি,/নটরাজ; কিংবা দিয়া চুন কালি গালে/খেদাও গহন বনে! (ঐ, পৃ. ১৮২) ৭. আইস মলয়রূপে; গন্ধহীন যদি। একুসুম, ফিরে ওরে যাইও তখনি! (ঐ. পঞ্চম সর্গ, পৃ. ১৮৭) [পৃষ্ঠার অনুসরণঃ মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত। দ্বি-প্র, ১৯৭৮]।

অনেক আরবি—ফারসি শব্দ কিছুটা উচ্চারণ বিকৃতির ফলে যেমন সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে, তেমনি কবিতায় অনেক আরবি—ফারসি শব্দ প্রয়োজনানুসারে স্থান করে নিয়েছে। বিষ্ণু দে—ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'হয়রান করে দিয়েছে'— বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটি মনে আসে, কোন সংস্কৃত থেকে আমদানি করা শব্দে তা হয়না।[১] প্রমথ চৌধুরী যিনি ছন্দচিন্তার দিক থেকে বিষ্ণুদে—কে প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি বলেছেন ফারসি শব্দ তালাক দিলে বাংলা ভাষার সংসার অচল হয়ে পড়বে।[২] আর তুর্কি এবং আরবি শব্দগুলো তো ফারসির মধ্য দিয়েই বাংলায় এসেছে। কাজেই বাংলা ভাষায়, তথা বাংলা কবিতায় আরবি—ফারসি—তুর্কি শব্দের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিষ্ণুদে—ও অস্বীকার করেন নি। তাই তাঁর কবিতায় আরবি—ফারসি—তুর্কি প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তুর্কি, হিন্দি, উর্দূ শব্দ ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিচ্ছিঃ

ফারসি

বেগানা, উমেদার, তক্তাপোষ, নাচার দরবার (ঈ), আশকারা, দিওআনা, গোমস্তা, সদাগর, শির; নিশান, ফরাস, মজুর, চশম, রসদ, জমিদার, দারোগা, পেশোয়াজ চরকা, বুনিয়াদ, হুশিয়ার, তীরন্দাজ, কোটাল (কাতওয়াল), ফিরোজা কাদিয়ান, মোহর, জাবেদা, (জাবিতহ্) বীমা, বাজু, কুস্তি, বরদাস্ত, বরকন্দাজ, গর্দান, জিন্দা—

বাদ, গুমথুন, নাজেহাল, গোর, ঝাবু (?), আবগারী, দুনিয়া, আওয়াজ, পরোয়ানা, সওয়ার, জামিয়ার, দিলদার, মজদুর, পাইক, পরগনা, শামিয়ানা, ওস্তাদ, আসান, দোসরা, বন্দর, দালাল, তারিফ, সিপাই, চেরাগ, চৌকি, বরাত, দরাজ, খোদাই, জল্লাদ, মালিশ, নালিশ, বখরা, পাজামা, জিঞ্জির, গুল (+বদন), বেকসুর (বে- ফা., আ- কসুর), হরদম, গোরস্তান, আফসোস, আস্তানা, জখম, ফেরারি, পাঞ্জাবী, গঞ্জ জবর, জেরবার, আরজি, মাহিনা, পাজি, খানশাহী, প্রভৃতি।

আরবি

জমায়েত, মুশকিল, মুরব্বি, মোলায়েম, শরিক, সেলাম, মাৎ, (বে)+ কসুর, ফেশাদ হাওয়া, হাকিম, বেলোয়ারী, ক্রোক, মালিক, নেহাৎ, উজির, খাজাঞ্চিখানা, খুনসুড়ি, মামুলি, কাফুন (কাফন), কেতাব, কাজী, খতিয়ান, বহর, নজর, হাকিম, তওবা, মুনাফা, কেল্লা, আমলা, নহবৎ, হামাম, গাফিলতি, জাহান্নাম, ময়দান, ঈদ-মোবারক, ফয়দা (ফায়েদা), তামাশা, মামলা (মুয়ামলা), হামলা, দীনক-কুচকাওয়াজ, আউওল, জুলুম, দোয়া, খয়রাত, জরিপ, জহরত, বালাই, মসনদ, খতম, তেজারতি, আমীর, ওমরা, আখের, মসজিদ, খাসকামরা, সাফ, খিদমদগার, খানা বায়না, কেয়ামত, বেকুব, মজলিশ, হিম্মত (+ওয়ালা), খেসারত, নাকাল জৌলশ, তখত (ঈ+ফা. তাউস), এলাহ কবর, তামাম, কাবার, কেরামতি, ইমান, জল্লা, হকুম (ফা. বরদার) গলদ আরজ (+ই), মরশুম, খবর (+পা. দার), তমশুক, খেতাব, প্রভৃতি।

তুর্কি

উর্দূ (শিবিব), ঠাকুর, বরদা, কুলি, সওগাত, দারোগা, খান প্রভৃতি।

হিন্দি

কলিজা, হাতিয়ার, হুন্ডি, তরোয়াল, বাটোয়ারা, আড়ও, জঞ্জাল, বর্গা, বাৎলা, লড়াই, জেলখানা, ভাল্লুক, বানর (বান্দর), বিঘা, বেনামী, বস্তি, চামার, ছত্র, চৌকি, চাদর (চাদ্দর), দালাল, ধুতরা, হুকুম, জোতদার, ঘটি তাঁত, নচ্ছার, কিচ্ছা, জমিদার প্রভৃতি।

আমাদের আলোচনায় বিষ্ণু দে-র কবিতায় উর্দূ শব্দকে পৃথক করে দেখানো হয় নি। কারণ, কাজটি ভীষণ শক্ত। একথা আজ স্বীকৃত যে, উর্দূভাষা বহিরাগত মুসলমানদের তৈরী একটি কৃত্রিম ভাষা নয়। উত্তর ভারতীয় সকল আধুনিক ভাষার মতো উর্দূও প্রাকৃতের অর্বাচীন রূপ অপভ্রংশেরই দূহিতা, যদিও তার সাহিত্যের লালন হয়েছে প্রধানত মুসলমানদের হাতেই।[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—উর্দূ ভাষায় যতই পারসী ও আরবী শব্দ থাক না, তবু ভাষাতত্ত্ববিদ জানেন তা ভারত বর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষার এক শ্রেণী। সে যা হোক, বিষ্ণু দে-র কবিতায় কিছু অভিনব কাব্যাংশের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১. মাঠে ক্ষেতে শোনা যায়ঃ বহুত বহুত আজ কাম।। (চিত্ত রূপম পৃথিবীর ২২)২. যতই হাঁকোঃ তৈয়ার হো কোমরবন্ধ বাধো,/যতই হানো নিষ্ঠাবন, যতই বকো কাঁদো-/পরিণতি কি মিথ্যা রয়? জনতা জিজ্ঞাসে। (উত্তরে থাকো মৌন, ২৪) ইত্যাদি।

বিষ্ণু দে আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দদ্রষ্টা কবি। শব্দকে তিনি দেখেছেন, বাজিয়ে দেখেছেন, তারপর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। বিশ্বের অফুরন্ত ভাণ্ডারের শব্দসম্ভারে তিনি তাঁর কবিতাকে সাজিয়েছেন। বিশ্বকে তিনি তার আপন–দর্পণে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাকে বলতে শুনি:

আমিই বস্তুর বিশ্ব বস্তুবাদী আমিই ভূঞ্জক,
জানালা দরজা সব আছে বটে, তবে সবই ঢাকা
চাতুর বিন্যাসে দেখা সংগঠনে কোথা আছে ফাঁকা,
অথচ নিঃশ্বাস চলে, দাসদাসী আনে লেহ্যপেয়
আমার জীবন তাই যুক্তিনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ শ্রেয়,
আমারই আকাশ আমি, নিজে করি নিজেই তর্পণ
আমি ব্যক্তি, আমি সঙঘ, বস্তুবিশ্ব আমারই দর্পণ।
(নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, ৫৪)

ফলে তাঁর কবিতায় বস্তুবিশ্বের অনেক অব্যবহৃত শব্দ আমরা দেখতে পাই। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপট থেকে তিনি শব্দ নির্বাচন করেছেন তাঁর কবিতার জন্যে। এবং সেগুলোর সার্থক ব্যবহার দেখিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি কবিতার শব্দের জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে গেছেন, আর গেছেন বিশ্বের কাছে। আমরা এখানে ইংরেজিসহ বিষ্ণুদে–র কবিতায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি:

ইংরেজি ও অন্যান্য শব্দ

হবি, মাইক, স্ট্রাইক, মিটিঙ, একসটেনশন, বেয়ারা, স্মার্ট, ক্যালেন্ডার, ড্রেন পাইপ, রিপোর্ট, রিপোর্টার, মনসুন, থীসিস, আর্টিস্ট, আইডিয়া, বায়োস্কোপ, অ্যাটম, অ্যাসফল্ট, টিফিন, ক্যাষ্টিলিভার, এক্সপ্রেস, পোলিং স্টেশন, ক্যাম্প, কাফে, ক্লাব, পেগ, কমিক, ডিভোর্স, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্, স্যান্ডউইচ, ফাউনটেন, সিরিয়াস, টেপ, এলার্জি, স্টার্কি, ড্যাম, এটিকেট, ডিয়ার, ক্লিয়ার, কিউ, রিজার্ভ ব্যাংক, সাবলিমেশন, স্যানিটারি বাথরুম, কার্ডিভাল, শর্টকাট, রেস, কর্পোরেশন, গ্রেসিয়ার, কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেকস, ইমাজেন্ট, ম্যানেজার, লীভার, ডেলি প্যাসেঞ্জার, ক্লজআপ, বোনাস, ডিনেষ্টর, ডেভিডেন্ট, প্যানিক, প্রিরাফায়েলাইট, ম্যাট, ক্লাট, জিন, পার্কস্ট্রীট, স্ক্যান্ডাল, প্লাটিনম, মেস, ফ্লিমস্টার, লায়ন্সরেন্স, রেড্‌রোড, ল্যাম্পপোস্ট, ব্রিজ, দ্রাশ, অর্গানাইজার, হিস্টিরিয়া, স্পঞ্জ, হুইস্কি, রাজ্রাসপেগ, হ্যাপীবয়, পেনশান, ডাস্টবিন, ক্রসওয়ার্ড, এসপ্লানেড, ভেজিভায়োলেট, ওয়াগান, ট্রেঞ্চ, বাংলো, ফানেল, ফার্নেস, কভার, গার্ডার, ক্রেন, গোল্ডেনবার, সাপ্লাই, সিগনালিং, স্টক এন্ড শেয়ার, অনোরোনীয়াম, কমেডি, ট্রেডমার্ক, ব্যারিকেট, ম্যানসন, কনসার্ট, গ্রানেট, কংক্রিট, কলোনি, এজেন্সি, কন্ট্রোল, বোর্ড, কর্টেল, ট্রাস্ট, রাবিশ, কমিশরিয়ট, ইডিওলজি, মেলডি, কোকাকোলা, প্যারেড, শেয়ার, এমেরিকান কার, পেরাম বুলেটর, হেলেনিস্ট, গথিক ক্যাথিড্রল, ম্যাকাডোম, ফিটন, পার্টি প্রভৃতি।

সঙ্গীতবিষয়ক শব্দ [৪]

সিমফনি, প্যোঁপাগীতি, স্বরদ, উর্দ্ সুর, গ্রামোফোন সঙ্গীত, পিলু বারোয়া, পূরবী বিভাগ, ভৈরবী, করতাল, গীটার, ঘরোয়ানা, মীড়, অর্কেস্ট্রা, দোহার, ভয়রো, ক্রুবাদুর, গমক, বোল, ভরত নাট্যম, সেতার, বৈতালিক, কনসার্ট, রেকর্ড সঙ্গীত, ভাটিয়ালী লোকসঙ্গীত, রাখালী, সারেঙ্গী, দুতারা, বসন্তবাহার, ষড়জ, রেখাবখাম্বাজ, দীপক, বেহালা, মল্লার, মালাকাশ, গান্ধার, বীণা, পরজ, পুরবৈঞা, সাহানা, কড়িকোমল, বসন্তবাহার, একতারা, মন্দিরা, উদারা, তারা, গৎ মৃদঙ্গ, কানাড়া, লয়, খোল, মাদল, ঝাঝ, পাখোয়াজ, তাল কীর্তন, ঢোলক, কথক, গম্ভীরা, কাফি, আশাবরী, তেহায়া, স্বর, টপ্পা, গীতবিতান, শিঙা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ধ্রুপদ, বাউল, কেল্পশনের ইংরেজি খেয়াল, জারী, কাওয়ালী, সারী, যাত্রা, গাজন, সুরস্রষ্টা, গীতকার, ভাটিয়ালী, ক্যাবারের নাচ, গায়কি গম্বিরা সুচিত্রা মিত্রের গান, সম, মুরলী মাথুর, লোকনৃত্য, কথক, খোল, দমক, বিস্তার, ইমন, বসন্ত বাউরীর গান, নহবৎ, শঙ্খ, মৎসার্ট, মাত্রা, কল্যাণ, হিন্দোল, আশাবরী কোয়ার্টেট, ফুগ, মিয়াকি মল্লার, চেলো, গান, টোড়ি, ঠাঁট, ঢিমাতাল, যোগিয়া, মৈহারী রাগিনী, বেহালা, ধূয়া, নটমল্লার আলাপ, ঝালা, পিনাক, লহরা, চৌতাল, সাহানদেবীর গান, রাগ মিঞাকীদীপক, রামলীলা, তূর্য বাঁশরী, তবলচি, তানসেনীস্বর, সুরসপ্তক, ঢাকঢোল, ফ্রানৎস শুবেট, আলী আকবর খাঁ, পদাবলী সঙ্গীত কাড়া, সোনাটা প্রভৃতি।

বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় শুধু ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করেন নি, ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের কবি–সাহিত্যিক–নাট্যকারদের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রকেও তুলে এনেছেন। ইংরেজি শব্দকে তিনি কিভাবে যথাযথ রূপে ব্যবহার করেছেন, তার দু–একটি উদাহরণঃ হৃষ্টপুষ্ট কণ্ঠ সুরে ফুটিফাটা কংক্রিটের ছাদ/ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্/... রাখালেরা সরব এখানে/ আর ভুবনের বউ নাকি চেয়েছে ডিভোর্স। (সংবাদ মুলত কাব্য ৭৭) সান্নিধ্যে সাযুজ্য নেই ওজনে মহিমা/উষার হৃদয় একা স্টক এন্ড শেয়ার, (বছর পঁচিশ ৩৯৯) ডিভিডেন্ড চেপে প্যানিক ছড়াই,/বাজারে মট-আমরা নড়াই,/ তারপর ছাড়ি অনডরসেল হাত চেপে/ভাগেভয়ে কেঁপে অংশীদার/হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি/চার ডিরেক্টর। (বছর পঁচিশ, ৫২৫) প্রভৃতি। শুধু ইংরেজি শব্দই নয়, বাংলা কবিতার মধ্যে তিনি ইংরেজি বাক্যকে চরিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমনঃ

১. লক্ষ বিঘা, তার পরে হন বুঝি শেয়ারে বুর্জোয়া।
Quantity changing in to Quality
গরিবেই চুরি করে, তাই মায় আর পরে বটে,
নিদেন জমায় পয়সা
(চিত্ত রূপম ও পৃথিবীর পৃ.৬৯)

২. কি অমানুষিক ক্ষতি করে দেখে বাদশাহী তারই–দেশে
What man has made of man!
আজকে অন্যত্র দাস বংশীদের নৃশংতা দেখে..
(বছর পঁচিশ, ১০০)

৩. **Beware the Jabberwock, my son!**
নিবাস আজব এই কলকাতা শহরে,
ফেটে ছিড়ে পচে আজ ওসাশে ও বহরে।
(চিত্ত রূপম ও পৃথিবীর· পৃ.৬৯)

বিষ্ণু দে অনেক কবিতার নাম, উপ–নামও অনেক সময় ইংরেজিতে দিয়েছেন। যেমন —কিরিয়েল, All Passion Spent, রিফ্লেকস প্রভৃতি। এমন কি একবার কোন কবিতার নাম বাংলায় দিয়ে পরবর্তীকালে তা ইংরেজিতে দিয়েছেন, যেমন — 'লেনিন পুরাণ নয়' কবিতাটি। উক্ত কবিতাটি *রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে* গ্রন্থে ঐ নাম ছাপা হলেও *ঈশাবাস্য দিবা নিশা*–য় ছাপা হয় *Lenin and no myth of Lenin* এই ইংরেজি শিরোনামায়। তবে এ–ধরনের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় বেশি নেই। কিন্তু এজরা পাউন্ড–টি. এস. এলিয়ট সহ অনেক লেখক–কবির ইংরেজি উদ্ধৃতি বিষ্ণুদের কবিতার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর এ–ধরনের প্রয়োগচেতনা বিজ্ঞতাবাহী। বিজ্ঞপাঠকের তা বুঝে উঠতে হিমসিম খেতে হয়। সাধারণ পাঠকেরা বিষ্ণুদে–র এ–ধরনের প্রায়োগিক এলাকার বাইরের বাসিন্দা। এবং সে বাসিন্দারা উসখুস করেন তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক শব্দগুলোর প্রয়োগ দেখেও (সাঙ্গীতিক অর্থে আমরা এখানে সঙ্গীত বিষয়ক শব্দের কথা বুঝিয়েছি)। বিষ্ণুদে তাঁর এক কবিতায় নিজেকে 'সুরের মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন।

সুরের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ অপরিহার্য। এবং তাঁর কবিতায় সঙ্গীত বিষয়ক শব্দগুলোর দিকে তাকেলে তাঁকে সুরের মানুষই বলে মনে হয়। শুধু সুরের মানুষ নন, সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদও বটে। ফলে পাঠকের পক্ষে, অনেক লোকের পক্ষেই সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাঁর কবিতা সম্পর্কে দুরূহতার অপখ্যাতি রয়েই যায়। তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক শব্দসম্বলিত একটি কবিতাংশ:

কিংবা উৎপ্রেক্ষা খুঁজি সুরে গানে
কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে বিন্যাসে গোষ্ঠীচক্রে প্রাণ পায়
কানাড়া বিংবা মেঘমল্লারে বা মালকোশের লম্বিত বাহুতে
যমুনা! সমুদ্রে দাও ছায়া দাও
মুরলী মায়ায় দাও নীল তমালের বনছায়া
চির বিরহীর বাহু বদ্ধ চির মিলনের সাধা
কোমল গান্ধার!

বিষ্ণু দে লিখেছেন

নরক প্রকাশ্য হোক, ইনফেরনো তখন
অঘমর্ষী উত্তরণ পুরগাতোরিও–তে,
যেন হিমপদে চলে কুন্তীর নন্দন, ...
(ঈশাবাস্য দিবানিশা,৬১)

এখানে ইনফারনো (Inferno) এবং পুরগাতোরি (Purgatory)[৫] শব্দ দুটো ইতালীয়। দান্তের *ডিভাইন কমেডি*-তে তিনটি ভাগ আছে Inferno, Purgatory ও Paradise। বিষ্ণুদে তাঁর কবিতায় Inferno ও Purgatory শব্দ দুটো ব্যবহার করে যে দুর্বোধ্যতা এনেছেন তা অনেক পরিশ্রমী পাঠককেও গলদঘর্ম করে ছাড়ে। শুধু ইতালীয় শব্দই নয়, বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ল্যাটিন, গ্রীক, রুশ, জার্মানী, পেরু, অস্ট্রেলিয়া, ফরাসি, পর্তুগীজ, চীনা, ভিয়েতনামী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি বা আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের ধারণা অস্পষ্ট নয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করে তিনি যে দুর্বোধ্যতার জন্ম দিলেন, তা তাঁকে জনগণের কবি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়। বিষ্ণুদে বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতম কবি। যদিও শব্দ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই-
> শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমে
> কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
> যোগাযোগ অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচার
> ধ্বংস হোক গাই, অভিধার স্বত্ব-নিপাতনে
> ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি কুঁজি পথের ধ্বনিতে
> জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে জীবনের দাবি।
> (*বছর পঁচিশ*, ৩৩৬)

বিষ্ণু দে-র কবিতায় ল্যাটিন, গ্রীক, রুশ, জার্মানী, ইতালীয়, ফরাসি—প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখলে তাঁর শব্দসম্পর্কিত এ কথা মেনে নেয়া যায় না। তবে আন্তর্জাতিক চিন্তার প্রতিফলনের জন্যে বিষ্ণু দে এমনটি করেছেন। আমরা বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে এ-ধরনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি:

লিবিডো, প্রলেতারিয়া (ল্যাটিন, প্রলেতারিয়াস) (ল্যাটিন), আর্কেডিয়া, ইউটোপিয়া (গ্রীক), রুদিন (রুশ), নাৎসি (জার্মানী), বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ, ফরাস, রেনেসান্স দিনেমার (ফরাসি), ম্যাজেন্টা (ইতালীয়), কুইনিন (পেরু), ক্যাঙারু (অস্ট্রেলীয়), গির্জা, ক্রুস, যীশু, নিলাম (পর্তুগীজ), ইয়াংচি, পিয়োর্থগিয়াং (চীনা), হো চে মিন (ভিয়েৎনামী) প্রভৃতি। ফরাসি শব্দ 'বুর্জোয়া'র প্রতি বিষ্ণুদের পক্ষপাত যেন একটু বেশি। যেমন, লেকে আজকাল সকলেই যায়!/ সকলেরই মতো ম্লান সন্ধ্যায় / তুমিও যাচ্ছ! কি বুর্জোয়া! চাকুরে সে মরস্বর্গে, বাংলার বুর্জোয়ার রেনেসান্সে এই আমাদের ছবি বুর্জোয়া বিকাশে বিজ্ঞ বলে এ বুর্জোয়া চাল, কবে থেকে বলো হলে বুর্জোয়া। চাকুরে বামনে ধরবে চাঁদ! প্রভৃতি।

বিষ্ণু দে-র কবিতা দুর্বোধ্য হয়েছে—একথা তিনি নিজেও বুঝতেন তাই তিনি মনে করতেন, যে কথা বোঝা যায়না, সে কথাই কবিতা:

> যে কথা যায় না বোঝা, যেটুকু যায়না পাওয়া
> সেটুকুতে কবিতাই, তাতে চলে গান গাওয়া
> তৃপ্তিহীন সে চাওয়ায়, আমাদের মিলের উপমা..
> কালে কালে বারংবার শেষ হয় এক খাদে বিরাট নিখিলে।
> (*বছর পঁচিশ*, ৩৬৫)

এ জন্যেই হয় তো বিষ্ণু দে-র কবিতায় এমন কিছু শব্দের সাক্ষাৎ পাই, যে গুলো বিষ্ণু দের ইচ্ছেকৃত প্রয়োগ। এ-ধরনের কিছু শব্দ উদ্ধার করি:

ব্রনহিল্ড, সীগফ্রিড, ফ্রানচেসকার, পিদসিকাতোর, এফেসাসী, ইয়াংকিডুড্‌ল, পিসিংগার, পিগসন, পার্থেনন, সিসিল রসেল, ভেরেশ্চাগিন, সন্তভিক্তোয়ার, ফ্রানৎস শুর্বেট, স্যার্ত ভিক্তোয়ার, সাক্কো ও ভানৎসেত্তি, আউসবিটজ বুথেন বালড, বেনেডিক্টস, ইওহান সেবাস্তিআন, হেরোডেরা সালোম, পর্সিলেন, বিল্‌ড, য়েনের গেআনেটেন্ হেবজেন, মুস্ এস্ জর্হিন, জীট মান্ ইঃরে ফানেন হেবন, জাইমকরডের এংগেল স্টেন, হবুলফ্‌গাং, মিল্লিওনেন, জাইড্ উম্‌শ্ লুংগেন, উন্‌ড্রের ডে র্, লিন-ডেন্, আন্‌ডের্ হাইডের, টান্‌ডারাডাই, মাইন্‌গুটের কামেরাড্ প্রভৃতি। তিনি তাঁর প্রথম কাব্যেই নিজেকে 'বিদেশি' বলে মনে করেছিলেন—

> মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশি পথিক,
> মুখোমুখি কথা বলি- চোখে লাগে অটল প্রাচীর।
> বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
> পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝিনাকো ভাষা যে এদের।
> (উর্বশী আর্টেমিস, ৫০)

বিষ্ণু দে তাহলে সত্যিই কি বিদেশি কেউ? তাঁর কি কোন কবিত্ব শক্তি নেই? তাঁর কবিতা সাধারণ পাঠক কেন, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিও বুঝতে পারেন না কেন? কেন বুদ্ধদেব বসু বলেন- আমাকে যদি শব্দার্থ ও উল্লেখ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, আমি নিশ্চয়ই ফেল করব।[৬] বুদ্ধদেব বসুর এ-উক্তি বিষ্ণুদে-র '*চোরাবালি*'-কে নিয়ে। তিনি আরও বলেছেন- আপনার (বিষ্ণু দে-র) কোনো কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারিনা।[৭] বুদ্ধদেব বসু যদি বিষ্ণু দে-র কবিতা বুঝতে না পারেন, তাহলে বিষ্ণু দে-কে কবির কবিও বলা যায় না। বিষ্ণু দে গবেষকের কবি। তাঁর কবিতা নিয়ে গবেষণা করা যায়, রসাস্বাদন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব বসুকে বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন- বিষ্ণু দে-র কবিত্ব শক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, সেটা দুর্বলতা। বিদেশি পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলো প্রায়ই যদি

তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি।[৮] কবিতা, আশ্বিন, ১৩৪২-এ প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র 'পঞ্চমুখ' শিরোনামাযুক্ত পাঁচটি ছোট কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এ- মন্তব্য করেছিলেন। বিষ্ণু দে-র শব্দব্যবহার তাঁকে বিচলিত করলেও তাঁর কবিত্বশক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসংশয় ছিলেন। তবে তিনি বিষ্ণু দে-কে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি কারণ রবীন্দ্রনাথ শব্দপ্রেমিক ছিলেন না। এবং ছিলেন না বলেই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা এক সময় অসম্ভব হয়েছিলো তিরিশের কবিদের।

রবীন্দ্রভক্ত সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, শব্দপ্রেমিক অভিনবত্বের সার্থক কবিদের পক্ষে বিশ্বপ্রেমিক মহাকালের মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।[৯] মালার্মে ভালেরিরা ছিলেন শব্দপ্রেমিক। ভালেরি দিগ্ব্যাপী শূন্যতায় দেখতে পেয়েছিলেন এক জ্যোতির্ময় রূপ। সে রূপ শব্দের। ঐ শব্দ স্বভাবতই হবে অনচ্ছ, এবং ঐ অনচ্ছ শব্দ যোজনায় কবি রচনা করবেন একটি আক্ষরিক অর্থে সৃষ্টিছাড়া ইমারত। আজকের কবিদের প্রধান সাধনাই হলো শব্দ-সাধনা। কবিতায় ঐন্দ্রজালিক শব্দ সম্পর্কে সার্ত্রে বলেছেন-its sonority, its masculine endings, its visual aspect compose for him a face of flash. ঐ সুন্দর মুখের প্রেমে পড়েছেন আধুনিক কবিরা।[১০] এবং বিষ্ণু দে-ও। তিনিও কবিতায় খুঁজেছেন শব্দের চরম অন্বিষ্টকে। ফলে তাঁর কবিতায় অনেক দুর্বোধ্য শব্দ, আন্তর্জাতিক শব্দ স্থান পেয়েছে। বিষ্ণু দে বিশ্ববিজ্ঞ কবি। তাই তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে শব্দময় বিশ্ব। তিনি নিজেও বলেছেন-

> এ আলোতে আমি আছি, আর আছে বিশ্ব চার পাশে
> সে বিশ্ব আমারই মূর্তি-দীর্ঘ ছায়া আমার মনের।
> (উর্বশী আর্টেমিস, ৪০)

তাই কবিতা কঠিন হতে বাধ্য। সুধীন দত্তের ভাষায়: সভ্যতার প্রাথমিক সরলতা আজ আর সম্ভব নয়। আজকের জটিল ও কুটিল জীবনে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ করেই কাব্য কল্পতরুর জন্ম দিতে হয়।[১১] তাই কবিকে হতে হয় কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক। এই বহুমুখী অভিজ্ঞানে ভাষা পায় কবিতা।[১২] কবিতার শব্দ জোগায়— অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে আমরা বিষ্ণুদে-র কবিতায় 'নকশাল' শব্দটির উল্লেখ করতে পারি। আমরা তাঁর কবিতায় পাই-১. এখন সবাই নকশাল বলে চারদিকে চায়।২. আগুন লাগায় সে-ও কি নকশালেরা? ৩. আকাশের যেন এক নকশালী মেজাজ, রাগ প্রভৃতি। কবিতার ভাবের প্রয়োজনে যখন যেখানে যে শব্দ প্রয়োজন, সে শব্দকেই তিনি নির্বাচিত করেছেন। শব্দের প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে তিনি গেছেন মধ্যযুগের কবিদের কাছে— ঘোচাও চম্পা, দুঁহু ছদ্মবেশ,/এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে, আকাশে ওকে মুক্তি দাও, তবে না দু হু কোরে/ বিচ্ছেদের কান্না জমে, বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গণে/ ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গানে / ঝরত যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রংগে /

বিগলিত চীর অঙ্গে রিমিঝিমি শব্দে রাত্রির আধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্র তারা/ লক্ষ লক্ষ মানস বলাকা/বার্তা আনে ঝাঁকে ঝাঁকে/ অনরোণীয়ান্/ কিংবা যেন বধুয়ার হাসি/ আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।

আমরা এখন বিষ্ণুদের কবিতার যৌগিক শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তাঁর অনেক যৌগিক শব্দ উপমানির্ভর যেমন–সিল্‌ক মসৃণ— এই যৌগিক শব্দটিতে একটি উপমা লুকিয়ে আছে। আবার কোন কোন যৌগিক শব্দ রূপক–নির্ভর যেমন সৃষ্টি–স্বপ্ন। আবার কখনো এমন যৌগিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দেখলে সংস্কৃত বাক্যাংশ বলে ভ্রম জন্মে, যেমন —

সাগর উত্থিতা উল্লাসের শপথে শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবনাম্বুরাশিরা শিনিবদ্ধ ধারায় মেলে বনরাজিনীলা
(নাম রেখেছি কোমল গান্ধার ৩৪)

বিষ্ণু দের কবিতা থেকে যৌগিক শব্দের একটি পরিচয় তুলে ধরা যাক:

স্বপ্নমূর্তি, হিমশুভ্র, হৃদ–ভাষা, মানসলোক, কোলাহল–কুৎসিত, জনতা–আঁধার, দধীচি–অস্থি, ওয়াবন–প্রিয়া, ম্যামন–মলিন, চেতনাঘর, এবস–মাতা, হিম–অবজ্ঞা, পূর্বরাগ–সুর, বনভবন (উঅ) মৃগ–তৃষ্ণিকা, মুক্তি–ইশারা, মরণমায়া, স্বপ্নশৈল, শুপ্তিশান্ত, মানসবলাকা, শশকবিষণ, পরাণ–পুতলা, প্রশ্নদূত।[১৩] মর–স্বর্গ, হৃদয়–উৎসব, শ্বেতোমিস্পর্শ, কবি–জীবন, স্বপ্ন–শিখা, মরণ–ক্লান্ত, ওতালৎস–ধ্বনি, মারক–আখর, গ্রীক নাগর, প্রলয়–কম্প্র, অগ্নিউদয়, দ্বিধা–দম্পতি, শকুনি–পাখা, স্বপ্ন–সারথি, সাধনা–সম্পাত, টপ্পা–ঠুংরি, মরণ–তৃষ্ণা, প্রাক্তন–পাশ্চাত্য, মরণ মারীচ, রঞ্জনরশ্মি–দিব্যালোক, চুম্বনতাড়না কম্প্র বায়ু, অপাপবিদ্ধমস্তাবির প্রভৃতি (চোবা), অশ্রু–বাষ্প, ধ্বংসস্তূপ, স্বভাবদুর্গ, বেবেল–শিখর, মনকোকনদ।[১৪] ভ্রকুটি–কুটিল, নিবিদ–বেদী, বাসুকী–আহার, আনন্দ তড়িৎ, উষসী–উষা, তুষার–ভৃংগার, গড্ডল–চড়ক, মলয়–প্রসাদ, মুক্তিস্নান, জীবনপ্রতিমা, অমৃত আঁধার, জনতাসাগর, মনসমরাল, আকাশগঙ্গা, স্বর্ণসূর্যরশ্মি, শ্রেণীভারনিলীনবসনা, আসন্ন মুমূর্ষা, যক্ষপ্রশ্ন কন্টকিত, আসন্ন শরৎ উষা, জীবনযাত্রা কাকলি মুখর প্রভৃতি (পুলে), মৃত্তিকা–বিলাস, স্বপ্নপালক, লবণআঘ্রাণ, অস্ত্রগৃধিনী, অস্ত্রমাতাল, মরণ–হ্রেষা বিপ্লবমকুর, বাণিজ্য–লক্ষ্মী।[১৫] সাম্রাজ্য ভাণ্ডার, সাম্রাজ্য চণ্ডী, ভ্রষ্ট স্বর্গ (সাভাচ), ঐশ্বর্যমাতাল, মিলনপ্রবাহ, যৌথ সরোবর, দূর্ভিক্ষ–বাহন, গৌরব প্রহর জীবনতট, মড়ক–পূজা, উত্তরা–সংবাদ, মরণমাতাল যৌবন প্রপাত, স্বপ্নবীজ, তেভগাকুহক, সমুদ্র বীজনস্নিগ্ধ, প্রগতি স্রোত, বিবস্ত্রমড্ডক (সচ), টুরিস্ট–খেউড়, অরণ্য তিমির, আনন্দ গাথা, তনু প্রান্তর, কর্মসূচী–মালা, আনন্দ সংগীত, অন্বেষা উৎসব, আনন্দ ভৈরবী। স্বাধিকার –প্রমত্ত।[১৬] অন্ধ যযাতি, ঘুম–ভাঙানিয়া, দক্ষ–নাট, হৃদয় সুরভি, ঝুলন পূর্ণিমা, তমালতালীবনরাজিনীল (অন), মৌরসীপাট্টা, সৌজন্য পসরা, জনসমুদ্র, বাহুভূজঙ্গ, জয়তারা, মানস হাস, প্রাণসূর্য, পাষাণ দেউল, পান্সি মাঝি, আনন্দ–সংহিতা, ভাস্কর্য বাহার, আকাশ প্রদীপ।[১৭] (আল) দর্পণ–দ্রষ্টা, স্বপ্নমূর্তি, ফুলথিক্ষেত, উপল উর্মিল, বিবাহ্–সভা, পার্থ–সারথি, মামল্ল–সেকত, (নারেকোগা), জনতা সন্যাস (তুশুপবৈ), আমনবৃষ্টি, নিজবাসভূমি। [১৮] ইংরেজি–নবিশ, অলকাসম্ভার, বেনেডি বটৃস তুর্য, তন্বী–শোভন, দময়ন্তী।[১৯] নল, স্ফটিক শীতল, ছাউনি–বস্তি, কৃষাণ–মুনিষ, মনন

ব্যবসায়ী, নক্ষত্র উৎসব, মরণরঙ্গ, ঐশ্বর্য-লক্ষ্মী, মানব-প্রেয়সী, মরণ-উৎসব, রবীন্দ্র-আলোক, হৃদয়বিলাস, ফরাসীস মান্দারিন মনাসুখ, কুলভাঙাকুল গড়া পাথর ভাসানো পলি তোলাপাল স্রোত (স্মৃতিসত্ত) কাক-জ্যোৎস্না, ঈথার সৌরভ, দ্বৈপায়ন গরিমা (সেঅচা), আবেগশাস্ত্র, বিজয়শঙ্খ, কর্তাভজা, কৌতুক-সঙ্গী (সমুকা), মৃত্তিকা মেদুর, চৈতন্য-জীবন, মানবজীবন, মানব-নিসর্গ, তিক্ততাজয়ী, দোমনা ছন্দ, গাল বাদ্য, কৃমি-কীট, রক্ষাব্যূহ, স্বপ্নযুথি, আগুনগলা মুক্তি, মল্লার ভেজাসবিতা, বাকদগ্ধ মহাবন, আগুন ঢালা শক্তি (ঈদিনি), আদম-উদ্যান, যবানেত্রী, পতন-উত্থান, শ্রোণিভারাদলস শয়না (চিরুমৃপ), প্রাণ-গংগা, হুজুগ-যাত্রা, মানব-স্মৃতি, জবিন-সংকট (উথামৌ)।

বিষ্ণু দের শব্দসম্পদ ধনাঢ্য হয়েছে নামবাচক বিশেষ্যের প্রয়োগনৈপুণ্যে। বিশ্বের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-শিল্পী-দার্শনিক যেমন তাঁর শব্দের সীমানাকে বাড়িয়েছে, তেমনি বাড়িয়েছে বিশ্বের বিখ্যাত স্থান এবং দেশের অল্পখ্যাত-অখ্যাত স্থানসমূহ। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত পশুপাখি কীটপতঙ্গ, তরুলতা, নদী, সঙ্গীতবিষয়ক শব্দও শব্দশিল্পী কবি বিষ্ণু দের অমূল্য মনি-মুক্তা। এখানে আমরা বিষ্ণুদে ব্যবহৃত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং দেশ সম্পর্কিত পরিচয় তুলে ধরছি, যাতে বিষ্ণুদের বিশ্ববীক্ষা নতুন কাব্য-প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত। বিখ্যাত ব্যক্তি:

বতিচেল্লি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,গান্ধীজী, র‍্যাঁবো (উআ), আবু সয়ীদ আইয়ুব, দা-ভিঞ্চি, প্লেটো, ম্যাকেনজি,-নায়ালে, শ্লেগেল, হেগেল, শেক্সপীয়ার, ক্লাইভ, ডালহসি, সক্রেটিস, বার্টন্ড রাসেল, ওঅর্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সমর সেন, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (চোবা), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বুদ্ধদেব বসু, বেঠোফেন, মার্কস, মাতিস, মালার্মে, অরুণ মিত্র, কালিদাস, শ, অডেন, অশোক মিত্র, হামফ্রিহাউস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কলম্বস (পুলে), শম্ভু মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, টিক্কা খান, আকবর (সম্রাট) টিখেনভ, রুমি, লোরকা, মনীন্দ্র রায়, মিল্টন, দীপঙ্কর (শ্রীজ্ঞান-অতীশ), পল এলুয়ার (সাভাচ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেলুকাস, কৌটিল্য, কান্ট, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, লেনিন, বড়ু চণ্ডীদাস, বাল্মীকি, ডায়ার, ডনোভন, নীরোদ মজুমদার, পিকাসো (সচ), নেরুদা, অশোক, দান্তে, বেভিন, ট্রুম্যান (অন), মরগ্যান, মাউন্ট ব্যাটেন, চার্চিল, হারুন আল রসিদ, লুই আরাগাঁ, চেঙ্গিশ খান, তৈমুর লং, হাফিজ, লেবেদেফ, গোর্কি (নারেকোগা), নির্মলকুমারী মহলানবিশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পাস্টেরনাক, এডগার-এলান পো, যামিনী রায়, হোয়াইটম্যান, শেরপা (আলে), শেলি (তুশুপবৈ), পলরোবসন, সেজান, সত্যজিৎ রায়, দান্তে (স্মৃসভ), ইয়েটস, এলিয়ট, মার্কটোয়েন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মূর, হপকিন্স, (সেআচা), হিটলার, মৃসো, ভালেরি (সমুকা), হোচিমিন (রকনিদে), সুকান্ত, নানক, করবেট, শেবজঙ্গ, বঙ্কিম, রামমোহন, ফ্রানজ কাফকা, গ্যয়টে, ফ্রয়েড (ঈদিনি), ব্রেখট, হেনডরসন, লক্ষণ সেন, মানসিংহ (চিরুমপ), পাউন্ড (উথামৌ), প্রভৃতি।

আমরা এখানে একটি নাম শুধু একবার ব্যবহার করেছি। অনেক নাম বিভিন্ন গ্রন্থে বারবার ফিরে এসেছে। তাই তাঁদের একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় শুধু বিখ্যাত স্থানকেই মূল্য দিয়েছেন, এমনটি নয়, অল্পখ্যাত বা অখ্যাত স্থানের নামও তাঁর কবিতায় দেখা যায়:

মলয় শীতলা দেশে সোনার বাংলায়
কলকাতার হাওড়ায়, বস্তিতে গম্বুজে
বেলেঘাটা কলুটোলা মুচিপাড়া কলাবাগানের
তালতলা চিৎপুর লালদীঘি বেনে পুকুরের,
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ কালিঘাট চড়ক ডাঙ্গার
অলিতেগলিতে
শ্যামপুকুর অলিপুর মেটিয়াবুরুজে
রাস্তায় সড়কে আশ্বিনের পুজামেলে ঈদমুবারকে···
(বছর পঁচিশ৪১৬)

স্থান : স্পেন, মগধ, খার্কভ, বাংলা, গ্রীস, রোম, ফ্রান্স, উজবেক, তাজিক, তুর্কি, কাজাক, চীন, জাভা, আংকারা, পাটনা, রাঁচী, আয়ারলন্ড, তেলেংগানা, বেলগ্রেড, প্যারিস, প্রাগ, বিদিশা, দিল্লী, কলকাতা, মহেঞ্জোদারো, সমরকন্দ, কম্বোজ, পানিপথ, হরপ্পা, জর্মান, ইন্দ্রপ্রস্থ, এলোরা, ইরান, দানেমার্ক, ঢাকা, চাটগাঁ, উজ্জয়িনী, মালয়, ভিৎমিন, ফেরগানা, লস এঞ্জেলেসে, কোরিয়া, দোয়াব, পাঞ্জাব, সন্দ্বীপ, জর্ডান, হলিউড, হিরোশিমা, মালাবার , ফিনল্যান্ড, মস্কো, নিউইয়র্ক, লন্ডন, পিকিং, সাহারা, এশিয়া, আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রুশ, চীন, দিয়েগোগার্থিয়া, বরেন্দ্র, বংগ, রাঢ় প্রভৃতি। এ নামগুলো বিষ্ণু দের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি শুধু বিখ্যাত বা অখ্যাত নাম ব্যবহার করে নিজেই দায়িত্ব সারেন নি। শব্দ–প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতাকে তিনি কখনো উপেক্ষা করেন নি। যেমন একটি উদাহরণ–

চলো যাই, হে চূড়ালো! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারত সাগরে চলো মামল্লাপুরমে কোনার্ক বন্দরে
কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিংবা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বালিতে মার্তাবানে ওদেসার আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে

বিষ্ণুদের কবিতায় বিশেষণের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আমরা তাঁর কবিতা থেকে কিছু বিশেষণ তুলে আনছি:

শীতল কোমল অন্ধকার, ভেদমুগ্ধ কম্পিত পুরুষ, তরুণ তমাল, দুঃস্বপ্ন রুক্ষ, পীড়িত চাঁদের মুখ, সমুদ্র বীজন স্নিগ্ধ দক্ষিণের কোমল বাতাস, শব্দময়ী অপ্সর রমণী, জ্ঞান বিজ্ঞ জরাবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ ভুবন, শব্দখর কুৎসিত নগর, মর্মর শীতল (উ আ), শ্যামল ঘুম, কোমল নীল ঘুম, মেঘের রেশমী আড়াল, নাচুনিধান, ধূসর সন্ধ্যা, জয়ন্তী সন্ধ্যা, আত্মম্ভরী স্থূল অধ্যাপক, বুদ্ধিদ্বেষী উদ্ধত শিক্ষক (চোবা), উদ্বায়ু ট্র্যাফিক, বিলাসী বর্ষা, শাণিত আকাশ, নাচিকেতা ঋণ, শীতকম্প্র ফরাস, সর্পিল উলুপী, শালপ্রাংশু হাত, শুভ্র আবির্ভাব, নিরানন্দ বুভুৎসা, মৌন নিরাশা, রোষ কষায়িত সন্ধ্যা (পুলে), অঙ্কুরিত আকঙ্ক্ষিতা, উল্লসিত লাবণ্য, হিংস্র লোভ, বিড়ম্বিত জ্যোৎস্না, পারুলমায়া,

উত্তোলিত ক্রোধ (সাভাচ), সহজিয়া ক্রুবাদুর, মৃত্যুঞ্জয় দেশ, গ্রাম্যরাগ, সরষে চোখ, অন্ধ আইন, ছত্রধর বাতাস, জাগ্রতমুক্তি, বিনিদ্র নির্মাণ (স চ) স্রোতগ বাক্য, সাতনরী প্রাণ, গুহায়িত স্বপ্ন, কঙ্কালী কোঠর, (অন), বীটেঅফেনী সিস্‌মনির গন্ধর্ব বাতাস, চপলপ্রতা, কর্মঠ বিশ্ব-পেপ্‌স হুঙ্কার, কয়বিঘা হাহাকার, হিমনদী ঘৃণা, আগ্নেয়গিরি ক্রোধ, গোলাপ গোলাপহাত, অপরাজেয় গ্রোসে ফুগের গান, আকাশের সিম্‌ফনিক সুর (নো রে কো গা), সর্পিল নহুষ, নীহারিকা জ্বলা চোখ, চিন্ময় কর্ম, বৃদ্ধ অহমিকা, ক্লান্তিহীন মৃত্যুহানারোখ, দীর্ঘদমী প্রেম (আ নে) লাল ভালোবাসা, ব্যাপক দুঃখ, দীর্ঘ আশা, মৌননীল হাহাকার, চওড়া আরাম, হেমন্তের বিলাপী বিলাপ (তু শু প বৈ), সর্বংসহ অন্ধকার, মায়ের চোখের স্নিগ্ধ অন্ধকার, 'প্রাজ্ঞ আলোক', দ্বান্দ্বিক.মৃত্যু, ধূসর সহঅবস্থান, সহিষ্ণু আবেগ, বৃদ্ধ আশা, শিংভাঙা ডাক, শরতের নবাবী আকাশ, প্রাজ্ঞ পিয়াল, পৃথিবীর মেঘল শরীর (স্মৃসভ), মূর্খ অন্ধকার, রূপালি গৌরব, চাল্‌সে কেরানী, রূপবান ইউক্যালিপটাস, কাল দগ্ধধূসর শহর, ভারিক্কি মাহাত্ম্য, ক্ষিপ্র জিজীবিষা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘৃণা, বিজ্ঞভীরু সমুদ্র (সে অ চা), জলের রাগ, জলের অদ্ভুত রাগ, লাজুকমেঘলাব্যক্তি, দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ বন্ধুর ছন্দের দুর্গে সহিষ্ণু জীবন, সর্বহারা জ্যামিতি, আণবিক দানব হুঙ্কার দীর্ঘআয়ু ফিনিসীয় শ্যেন, ন্যাড়া বিশ্ব, স্নায়ুর রক্তিম সন্ধ্যা নীলের ধূসর সত্তা, স্বপ্নের স্ববশ যুক্তি, ফরাসিস মনীষা, (সমুকা), নাক্ষত্রিক নীল, প্রাজ্ঞ পারিজাত, বিবর্ণ শেফালি, নীরক্ত গোলাপ, নকসাবোনা মীনকেতু, বিকলাঙ্গ ক্ষত বিশ্ব, হিন্ময় সত্য, কুসুমিত সাধ, অপোগণ্ড মন, প্রাজ্ঞমৃত্যু, তন্বংগী চঞ্চলা, বেগোচ্ছিত নদী, রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে, রাবীন্দ্রিক সূর্যোদয়, সরল মৃত্যু, রাবীন্দ্রিক পূণ্যবর্ষ, গোয়ার মিল্টন, শান্তি মগ্ন এষা, পোড়াদেশ, (ঈ দি নি), নকশালী মেজাজ নীল স্বপ্নোত্থিত ইউটোপিয়া, উড়নচণ্ডী, ফাঁসির চড়ক, হাজারী সুন্দরী মমতাজ (চি রু ম পৃ) প্রভৃতি।

বিষ্ণু দে-র বিশেষণ-প্রীতি তাঁকে কবিত্বশক্তির গৌরময় মহিমা প্রদান করেছে। তাঁর ভাষাভঙ্গিতে বিশেষণগুলো এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

বিষ্ণু দের কবিতায় সর্বনামের গৌরবার্থক রূপ ছাড়াও তুচ্ছার্থক রুপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর কবিতায় মোর, মোরা, তুই, তেনারা, অমুক তমুক প্রভৃতি সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। যেমন,

নিঃশ্বাস মোর গন্ধে আতর ভারাক্রান্ত মোহে, (উ আ ২২), অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা (চোরা ১৬) যাঁদের দায়িত্ব জানা, জানেন না কেউ তেনারা (ব পঁ ৯৯) আখের তুই খোয়ালি হায় তোর মাঝে যে বর্তায় (নারেকোগা, ৭১) প্রভৃতি।

অব্যয় ব্যবহারেও বিষ্ণু দে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতায় অথবা, এবং অথচ, যদিচ, হে, অয়ি, যেন বা, অপিচ, কদাচ, আর, কিন্তু, বস্তুত, কিংবা, বরঞ্চ, তাই, সুতরাং, অপিচতা প্রভৃতি অব্যয়ের সাক্ষাৎ মেলে। কিছু উদাহরণ-

এবং আশা অমর, তাই তাকাই সেইকালে,
যদি ও আজ দিনের বাঁচা নিয়েই হিমশিম,
তবুও ভাবি আজের গিট কালকে কোন সূত্র
খুলবে, ভেবে প্রবীণ গান জমাই চৌতালে।
(বছর পঁচিশ ১২৮)

তাছাড়া, আরও যেমন-যদিচ কালের বিকাশ বা ইতিহাস অনিবার্য নদী। অপিচ যন্ত্রণা, সেই তো গৌরব হে বৈদেহী, অয়ি পতিব্রতা। / অশোক কাননে নই রক্তময় ফুলখেলারত। প্রভৃতি।

বিষ্ণুদের কবিতায় ক্রিয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়-

কবি কিশোর ফিরেছি পথে পথে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত পাণ্ডু মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।
(চোরাবালি ৪৩)

ক্রিয়ার অপভ্রংশরূপও তিনি ব্যবহার করেছেন- লিসির গলে পরায়ে দিনু মালা। (চোবা, ৪৪) তাছাড়া গেলুম তাকালুম, হলুম, বইতুম, রইতুম, ধরিবারে, হেরিলাম, গড়িতেছিলাম, ভাবিত, ভেদিবারে, আছড়িয়ে, মেলালুম, আগাইয়া প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিষ্ণু দে-র কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণু দে, আধুনিক যুগের সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রচুর নামধাতু ব্যবহার করেন নি। তবে তাঁর সমস্ত কবিতা-গ্রন্থ থেকে নামধাতুর একটি তালিকা করা যায়- সে তালিকা অবশ্য ছোট হবে,

দূষি, চূর্ণিতে, রচে, জিনি, উথলি, উছলি, মন্থিয়া, সম্বরো, বন্দে (বন্দনা করে) সম্ভাষে, পূজিবারে, সম্বরি, পূজিলাম, ক্ষরে (ক্ষরণ করে), বিস্তারি, লভিলাম, ছাড়ি, আহরি, উগারিছে, অবহেলে, অর্জেছে, পশেছে প্রভৃতি।

বিষ্ণু দে তাঁর অনেক কবিতায় নতুন অর্থাৎ নিজের সৃষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা তাঁর কবিতার ভাষাভঙ্গিতে নতুনত্ব এনেছে। যেমন-চিত্তে হানে উলঙ্গতাওকে! (উ আ ১৫), মুছে দিলে হায় পিঙ্গলিমায় আমোঘ বজ্রপাণি। (ঐ ২২) ক্রন্দন্ত বর্ষায় ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত/কৃষ্ণবাস বনানীকে। (চোবা ১৫), ভাষা দিলে অলৌকিক সীমান্তিক এ সন্ধ্যা ক্ষণের (ঐ-১৯), আমার জাগর স্বপ্নে দ্বৈতছন্দে অদ্বৈত নূতনে/সে কি সৃষ্টিময় বদ্ধ স্বভাবের দুরন্ত কল্পনা? (সেঅচ-১৪) প্রভৃতি। বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ছোট-মাঝারি-বড় বাক্য ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শব্দকে যথাস্থানে প্রয়োগ করে বাক্যের বলিষ্ঠতা এনেছেন, নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলেছেন। সুইফ্‌ট বলেছেন- Style may be defined. "proper words in proper places"[২০]

একথা বিষ্ণু দে সম্পর্কে স্মরণে আনা যায়। বিষ্ণু দে-র একটি ছোট বাক্য- দুর্ভাগ্য আমার। (চোবা-৫৮) ম াঝারি বাক্য-বিদায় যে নেব, তাও মনে হয় অকালেই কুসুমিত সাধ, / কারণ সমাজ দেখি, নিসর্গেও, মনে হয় ঘোর অসময়

(ঈদিনি-৩২) 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কবিতাটিতে পংক্তি সংখ্যা ৫৪, স্তবক সংখ্যা ৬-কিন্তু কবিতা একটি মাত্র বড় বাক্যে সমাপ্ত। বিষ্ণু দে-র একটি ছোট স্তবক—— 'অনেক দিনের অনেক যত্নে কমিয়েছি সন্ত্রাস। (সমুকা ৬৮), মাঝারি স্তবক- উর্বশী ও আর্টেমিস কবিতার শেষ স্তবকটি *পূর্বলেখ*-এর পদধ্বনি, *সাতভাই চম্পা* ভারতীয় বিমান বাহিনী, *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*-এর অসময় কবিতাগুলো যথাক্রমে ১২০, ২৯, ২০ পংক্তিতে গঠিত হলেও সেগুলো একটি করে স্তবকে সমাপ্ত। বিষ্ণুদের ব্যবহৃত বাক্য—— তাঁর স্তবককে করেছে গতিশীল এবং শিল্পিত। এবং তাঁর বাক্যগুলো প্রাবচনিক মর্যাদা পেতে পারে। ল্যান্তর বলেছেন- Every good writer has much idiom it is the life and spirit of language.[২১] বিষ্ণু দের স্তবকে এমন ধরনের প্রাবচনিক বা প্রবাদযুক্ত বাক্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমরা কিছু উদাহরণ দিচ্ছিঃ মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ (উ আ-২০), স্বপ্নেরা হল ফনিমনসার বন (চোবা-২৩), শিল্পীজনের মিতালীতে শুধু শ্লেষ (ঐ, ৩৭), প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আরেক, (নারেকোগা, ৯১), প্রকৃতিই মানবিক রচনা, (ঈবাদিনি, ৪৭), অথচ জীবন আজ বিশ্বব্যাপী জ্বালা, (ঐ-৫৪), চৈতন্যের ইতিহাস বই (ঐ-৬৪), বাঁচাই জীবন, (ঐ-৬৯), জীবনে দেওয়া সে কঠিন জয়।/সে কঠিন জয় শুধু গরিবেরই সয়।। (ঐ-৭৩), রাজনীতি কাব্যময় প্রাজ্ঞ এক ক্রোধ, (ঐ-৭৭), সময়ের স্বাস্থ্য ভাঙে আর থেকে থেকে মন ভাঙে, (ঐ-৯৯), শিল্পের বাজার মন্দা, কবিতাও বাঁচে শুধু কঠিন সংবিতে, (ঐ-১০২), আমরা নরকে আছি, (বর্প-৯), তোমার শরীরে পাই প্রকৃতির প্রতিটি উপমা, (ঐ-১০), গম্য কোথা, সব পাড়ায় বন্ধ দ্বার ৯ঐ-৪৫), তুমি যে প্রতীক, তোমার প্রেয়সী প্রতিমা (ঐ-৭৮), রবীন্দ্র আলোকে আমাদের জন্ম (ঐ-১০৭), বয়সে ঘুমের চাঁদ স্বপ্নময় কৃষ্ণ পক্ষে যায়, (ঐ-১২৬), শিশুর নিশ্চিতি চাই বয়স্ক মননে, (ঐ-২৩৮), আমরা সবাই চাই সংক্ষেপিত সুখ (ঐ-২৬৩), এই দেশে ভাষা নেই সাধারণ মানুষের, (ঐ-২৮০), আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ (ঐ-২৯৬), জীবন গড়া- জীবনই তো প্রেমের ফাল্গুন (ঐ-৩৩২), জুলুমের জ্বালানি·আমরা (ঐ-৩৩৫) অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায়, (ঐ-৪২১), এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে (ঐ-৪৮৮), প্রেম বহু রূপী (ঐ-৫০৪), আশাই জানি মানবিক ধর্ম, সত্তা, বাণী, (চিরুম পৃ-৩৫), আজ বুকের গোনা হাড়ে (সমুকা-৭২) প্রভৃতি। ইচ্ছে করলে বিষ্ণু দের কাব্য থেকে এ-ধরনের উদ্ধৃতিযোগ্য বাক্য, বাক্যাংশ ক'পৃষ্ঠা বাড়ানো যায়। তিনি শুধু যে নতুন বাক্য বা বাক্যাংশ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন তা নয়, অনেক প্রবাদ প্রবচনকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। সে ধরনের কিছু উদাহরণ, যেমন- রেখে যায় অরণ্যে রোদন কোন নগরে অন্য কোন উচ্ছিষ্ট সন্ত্রাসে, (নারেকোগা-৮০), বড়োর প্রেম নেহাৎ বালু, (ঐ-৪২৬), কষ্টে

কেষ্টলাভ জানো তো প্রভাব/··· মুখে নেই, তাই ভূতে কিলানো সাধ। (ঐ-৪৮৯), প্রভৃতি।

তথ্যনির্দেশ

১. *বাকপ্রতিমা: বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৫৬
২. বাংলাভাষা, শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৬৪
৩. *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, মনিরউদদীন ইউসুফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১
৪. আধুনিক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে সবচেয়ে বেশি সঙ্গীতবিষয়ক শব্দ ব্যবহার করেছেন।
৫. Pargatory একটি স্থানের নাম। রোমান ক্যাথলিক মতে, মৃত্যুর পর আত্মাসমূহকে ছোট খাটো পাপ হতে মুক্ত করা বা উক্ত পাপ মোচনের স্থানের নাম। দ্র. SEBD P. 901, Pargatory -ßf TqJP≤J @PZ- Canto 1-xxxiii kpt∂Ç hs. The Divine Comedy. Dante Alighieri. Trn. Henry F. cary, The Harvard Calssics, vol. 20, 1937
৬. *কালের পুতুল*, বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ৭৮
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৮. *রবীন্দ্রনাথের চিঠি:* বুদ্ধদেব বসুকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৮২-৮৩
৯. *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, আবু সয়ীদ আইয়ুব, পৃ. ২১৯
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮-১৯
১১. 'কাব্যের মুক্তি': *স্বগত*, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতী ভবন, ১৩৪৫, পৃ. ৩৪
১২. Accordingly the conception of intellectual backgroud of artist was such a required him to be familiar with the largest possible number of bran ches of learning both philosophical and scientific; it also required him to be throughly familiar with the works of his predecessors. It was this conception which was responsible for raising poets from the position of common workman to the rank of equality with philosophers and scientists. Comparative Aesthetics. vol ii. Dr. k. C. Pundy উদ্ধৃত, *মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস*, ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃ, ১৩
১৩. 'প্রশ্নদূত' শব্দটি কালিদাসের 'মেঘদূত'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। মেঘদূত-এর অনুসরণে অনেক দূত কাব্য রচিত হয়।-পবনদূত, শিলাদূত, হৃদয়দূত, চেতদূত, বাতদূত, চন্দ্রদূত, তুলসীদূত, নেমীদূত, মনোদূত, পদাঙ্কদূত, হংসদূত, পিকদূত, কপিদূত প্রভৃতি।
১৪. 'মনকোকোনদ' মাইকেলেও আছে- মধুহীন করোনাগো তব মনঃ কোকনদে।-মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, পৃ. ২৪১

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার নাম– বাণিজ্যে বসতে লক্ষীঃ *সঞ্চয়িতা*, (ক্ষণিকা), বিশ্বভারতী, ১৯৭১, পৃ. ৪১৪
১৬. স্বাধিকার প্রমত্ত কালিদাসে ব্যবহৃতঃ কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা, স্বাধিকার প্রমত্তঃ *কালিদাসের মেঘদূত*, বুদ্ধদেব বসু অনুদিত, পৃ. ৮৪
১৭. *আকাশ প্রদীপ* নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য আছে– সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামে উৎসর্গিত, দ্র. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ২৩, পৃ. ৭২
১৮. 'নিজবাসভূমে' এই নামে শামসুর রাহমান কাব্য লিখেছেন। *নিজবাসভূমে*, শামসুর রাহমান, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, তৃ-মু, ১৯৭৪
১৯. দময়ন্তীকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য আছে। দ্র. *দময়ন্তী*, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫৩
২০. *The New Dictionary of Thoughts*, Tryon Edwards P. 617
২১. Ibid, P. 619